আমার কবি রফিক আজাদ

ইমদাদুল হক মিলন

রফিক ভাই গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার লেখাটা পড়ছি। এই লেখা তুমি জোর কইরা ছোট করার চেষ্টা করবা না। লেখা যেইভাবে আগায়, আগাইবো। যতবড় হয় হইব। আমি এই লেখা ছাপবো।

একজন কবিকে নিয়ে আমি উপন্যাস লিখেছিলাম। কবির নাম রফিক আজাদ। উপন্যাসের নাম 'দুঃখ কষ্ট'। রফিক আজাদের কবিতা থেকেই রাখা হয়েছিল নামটি।

'পাখি উড়ে গেলে পাখির পলক পড়ে থাকে
কঠিন মাটিতে।
এই ভেবে কষ্ট পেয়েছিলে'

'৭৮ সালের কথা। আমি তখন রফিক আজাদের প্রেমে মগ্ন। তার একেকটা কবিতা বেরোয়, আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই। চব্বিশ ঘন্টার আঠার ঘন্টায়ই কাটাই রফিক আজাদের সঙ্গে। তিনি আমাকে আদর করে ডাকেন 'বেটা' আমি ডাকি রফিক ভাই।

'ইত্তেফাক' ভবন থেকে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বেরুবার তোড়জোড় চলছে। কাগজের নাম 'রোববার'। আমি জগন্নাথ কলেজে অনার্স শেষ ক্লাসে পড়ছি। বিষয়, অর্থনীতি। রফিক ভাই বাংলা একাডেমীতে কাজ করেন। বাংলা একাডেমীর মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার' এর সম্পাদক। কিন্তু সেই কাজ তার ভালো লাগছে না। যখন তখন অফিস ফাঁকি দিচ্ছেন। দুপুর কাটাচ্ছেন সাকুরা গ্রীন কিংবা অন্য কোন কারণ। দুপুরের পর চলে যাচ্ছেন ইত্তেফাক ভবনে। রাহাত খান তার বন্ধু। রোববার পত্রিকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রফিক আজাদকে। বাংলা একাডেমীর চাকরি রেখেই রোববার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। নিজের নাম উহ্য রেখে রোববারের কাজ করবেন। সকাল থেকে দুপুর অব্দি বাংলা একাডেমীতে, দুপুরের পর থেকে 'রোববার'। আমার অনার্স পরীক্ষার বিশেষ বাকি নেই। ইকোনোমিক্স মাথায় উঠে গেছে। সকাল বেলা আমি গিয়ে হাজির হই বাংলা একাডেমীতে, রফিক আজাদের টেবিলের সামনে বসে কাপের পর কাপ চা খাই, একটার পর একটা সিগ্রেট খাই। পকেটে টাকা-পয়সা থাকলে রফিক ভাইকে নিয়ে দুপুরের মুখে মুখে চলে যাই কোন বার কাম রেস্টুরেন্টে। সেখানে পানাহার করে ইত্তেফাক ভবন, রোববার অফিস। জীবনের প্রথম চাকরি হল রোববারে। জুনিয়র রিপোর্টার বা এরকম কিছু। বেতন চারশ' টাকা।

টাকা-পয়সা নিয়ে কে ভাবে। রফিক আজাদের সঙ্গে থাকতে পারছি, কাজ করতে পারছি এটাই তো বিশাল ব্যাপার।

এসবের বছর দুয়েক আগে রফিক আজাদের সঙ্গে আমার পরিচয়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক তখন 'বিচিত্রা'। বিচিত্রায় আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম 'না সজনী'। সেই সময়কার যুবক-যুবতীদের নিয়ে লেখা একটু অন্য ধরনের প্রেমের গল্প। রবীন্দ্রনাথের গান থেকে নাম নেয়া হয়েছে। চারদিকে ভালো একটা সাড়া পড়েছে। আমি গেছি বাংলা একাডেমীতে। দোতলার একটা রুমে রশিদ হায়দার, সেলিনা হোসেন আর রফিক আজাদ বসেন। রশিদ হায়দার আমার পরিচিত। তার ছোট ভাই জাহিদ হায়দার আমার বন্ধু। ওদের চতুর্থ ভাই দাউদ হায়দারের জন্য পরিবারটি খুবই বিখ্যাত। সবাই লেখালেখি করেন। রশিদ হায়দার গল্প-উপন্যাস লেখেন। আমি তার টেবিলের সামনে বসে আছি। পাশের টেবিলে মাথা গুঁজে কাগজপত্র ঘাঁটছেন সেলিনা হোসেন। বাংলা একাডেমীর ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'ধান শালিকের দেশ' সম্পাদনা করেন তিনি। আমার দিকে একবারও ফিরে তাকাননি। একটু দূরে কোণের দিককার টেবিলে বসে আছেন রফিক আজাদ। আমি তাকে চেহারায় চিনি। কুস্তিগিরদের মতো চেহারা। বেঁটে, তাগড়া জোয়ান। হাতকাটা

Munshigonj.com

গেঞ্জি পরেন, গলায় চেন, হাতে বালা। নাকের তলায় ইয়া গোঁফ, হাতে সারাক্ষণই সিগ্রেট। ঢাকার রাস্তায় ড্রাগ খেয়ে মোটরসাইকেল চালান। ‘বিচিত্রা’ তাকে নিয়ে কভার স্টোরি করেছিল।

কাছ থেকে রফিক আজাদকে কখনও দেখিনি। রশিদ হায়দারের টেবিলে বসে আড়চোখে দেখছি। সাদা রংয়ের হাতাকাটা টাইট গেঞ্জি পরা। গলায় মোটা চেন, এক হাতে তামার বালা, অন্য হাতে সিগ্রেট। উত্তরাধিকার পত্রিকার কপি দেখছেন। সামনে চায়ের কাপ।

এসময় একটা মজার ঘটনা ঘটল।

হাতের কাজ ফেলে চায়ে চুমুক দিলেন রফিক আজাদ। রশিদ হায়দারকে বললেন, ওই রশিদ, বিচিত্রায় এ সপ্তাহে একটা ছেলে গল্প লেখছে, ইমদাদুল হক মিলন নাম, তুই চিনস?

রশিদ ভাই হাসলেন। এই তো আমার সামনে বইসা আছে।

রফিক আজাদ আমার দিকে তাকালেন। ওই মিয়া এইদিকে আসো।

আমার তখন বুকটা কেমন ধুগধুগ করছে। বিচিত্রায় আমার লেখা ছাপা হয়েছে সেই খবর রাখেন রফিক আজাদ, আমাকে ডাকছেন তার টেবিলে। যে কবি আমাদের হিরো, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো?

রফিক আজাদ জাঁদরেল মুক্তিযোদ্ধা। কাদের সিদ্দিকীর সহকারী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারী। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় কবিতা লিখে দেশ কাঁপিয়ে দিলেন। ‘ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো’। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায়। কবিতা চলে গেল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে। সরাসরি তাকেই আক্রমণ। পুলিশ ইনটেলিজেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি মহল তৎপর হয়ে উঠল। বঙ্গবন্ধুর কানে গেল এই ঘটনা। তিনি রফিক আজাদকে ডেকে স্নেহের ধমক দিলেন। সংশয় কেটে গেল। বন্ধুরা ধরে নিয়েছিল কবিতা লেখার অপরাধে রফিক আজাদকে জেলে যেতে হবে।

আমার চেহারা কিছুটা রফিক আজাদ টাইপ। পরনে জিন্স, ফুলস্লিপ শার্টের হাতা গুটানো, মাথায় লম্বা চুল, কসাইদের মতো ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে ঝুলে পড়া মোচ। দেখতে গুণ্ডাদের মতো। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রফিক আজাদ বললেন, বসো।

Munshigonj.com

বসার পর বললেন, তোমার গল্পটা আমি পড়ছি। একটা কাজ করো, উত্তরাধিকারের জন্য একটা গল্প দেও। কবে দিতে পারবা?

সপ্তাহখানেক।

ঠিক আছে। চা খাইবা?

না।

আরে খাও মিয়া।

চা আনলেন। আমি তখনও কিছুটা আড়ষ্ট। চা খেয়ে উঠে আসছি, রফিক ভাই আমার পিছু পিছু এলেন। রুম থেকে বেরিয়ে বললেন, ওই মিয়া, একশ’ টাকা দিয়া যাও।

আমি হতভম্ব। বলে কী? এইমাত্র পরিচয়, এইমাত্রই ধার!

আমার পকেটে তখন টাকা থাকে। বড়ভাইয়ের কনস্ট্রাকশন বিজনেস আমি খানিকটা দেখি। ইকোনোমিক্স পড়া, উন্মাদের মতো লেখালেখি, একটি বালিকার সঙ্গে প্রেম এতকিছুর ফাঁকে বড় ভাইর বিজনেস দেখি। পকেটে সবসময় ডানহিলের প্যাকেট। ডানহিল দামি সিগ্রেট। ওই সিগ্রেট দেখেই রফিক ভাই বুঝে গিয়েছিলেন আমার পকেটে টাকা আছে। ডানহিল সিগ্রেট তাকে অফারও করেছিলাম। তিনি যেন অতিশয় দয়া করে সিগ্রেটটা নিলেন। দু-তিনটা টান দিয়ে বললেন, ধুরো মিয়া, এইটা কী সিগ্রেট খাও? ভাতের মতন লাগে।

মানিব্যাগ থেকে খুবই বিনয়ের সঙ্গে একশ’ টাকার একটা নোট বের করে দিলাম। মনে মনে ভাবছি, আমাকে কি শালা ধোর (মক্কেল) ভাবলো নাকি। লেখার সঙ্গে একশ’ টাকাও চাইল?

কিন্তু রফিক আজাদের জন্য গল্প লিখতে বসে ভালো রকম ফাঁপরে পড়ে গেলাম। বিক্রমপুর অঞ্চলের একটা গ্রামের বাজার, বাজারের মানুষজন, সার্কাসের জোকার, হতশ্রী এক বেশ্যা, একজন হিন্দু কম্পাউন্ডার, একজন পাগল আর নিয়তির মতো একটি সাপ এসব নিয়ে লিখতে শুরু করেছি। লেখা

তরতর করে এগোচ্ছে। প্রচলিত গদ্যের ভেতরে ভেতরে নির্বিচারে ব্যবহার করে যাচ্ছি বিক্রমপুরের আঞ্চলিক শব্দ। সপ্তাহখানেক লেখার পর দেখি ফুলস্কেপ কাগজের চব্বিশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে কিন্তু লেখা শেষ হয়নি। শেষ কী, মনে হচ্ছে যেন একটি চাপ্টার মাত্র শেষ হয়েছে।

আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

রফিক ভাই এক সপ্তাহের টাইম দিয়েছেন, উত্তরাধিকারের মতো পত্রিকায় ছাপা হবে লেখা, সেই লেখা শেষ হচ্ছে না? খুবই অসহায়, কাতর অবস্থা। চব্বিশ পৃষ্ঠা হাতে নিয়ে গেলাম বাংলা একাডেমীতে! রফিক ভাই খুশি। লেখা আনছো? দেও।

দিলাম। তিনি চোখ বুলাতে লাগলেন। '৭৬ সালের কথা। আমার হাতের লেখা তখন পরিষ্কার, গোটা গোটা। শিশুরাও পড়তে পারবে। তখন কম্পিউটার কম্পোজের নামই আসেনি পৃথিবীতে, সাবেকি টাইপ রাইটারে টাইপ করানো বেশ খরচের ব্যাপার। জেরোস্ক মেশিনও সর্বত্র পাওয়া যায় না। জেরোস্কোর চেয়ে ফটোকপি শব্দটা বাংলাদেশে বেশি প্রচলিত। আমি ফটোকপি করার কথাও ভাবিনি।

রফিক ভাই লেখা দেখছেন, ভয়ে ভয়ে বললাম, রফিক ভাই, লেখাটা শেষ হয়নি।

তিনি চমকালেন, কী কও মিয়া! শেষ হয় নাই মানে?

শেষ করতে পারিনি। লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে।

রফিক ভাই চিন্তিত ভঙ্গিতে সিগ্রেট ধরালেন। তখন তিনি বেদম সিগ্রেট খান। একটার আগুন থেকে আরেকটা ধরান। আমি অপরাধীর মতো মুখ করে বসে আছি। সিগ্রেট টানার ফাঁকে ফাঁকে আবার লেখাটায় চোখ বুলালেন তিনি। তারপর বললেন, ঠিক আছে! লেখাটা আগে আমি পড়ি। এক সপ্তাহ পরে আইসা খবর নিও।

গেছি এক সপ্তাহ পর। রফিক ভাই গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার লেখাটা পড়ছি। এই লেখা তুমি জোর কইরা ছোট করার চেষ্টা করবা না। লেখা যেইভাবে আগায়, আগাইবো। যতবড় হয় হইব। আমি এই লেখা ছাপবো।

আঠারো মাস ধরে সেই লেখা উত্তরাধিকারে ছেপে গেলেন রফিক ভাই। আমার প্রথম উপন্যাস 'যাবজ্জীবন' লেখা হল এভাবে। এই আঠারো মাসে বিখ্যাত হয়ে গেলাম আমি। সাহিত্যের মেধাবী পাঠক, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জনৈক ইমদাদুল হক মিলনের ব্যাপারে একটু নড়েচড়ে বসলেন, উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

Munshigonj.com

যাবজ্জীবন লেখার সময় দিনের পর দিন রফিক ভাই আমাকে সাহিত্য বুঝিয়েছেন, বাংলা বানান শিখিয়েছেন। তখন আমি এত ভুলভাল লিখি। সাহিত্যের পড়াশোনাটা একদম নেই। রফিক ভাই লেখকদের নাম বলেন আর আমি সেসব লেখকের লেখা খুঁজে খুঁজে পড়ি। দিনে দিনে সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে গেল, রফিক ভাই-ই আমার ধ্যান-জ্ঞান-প্রেম। রাতেও গিয়ে কখনও কখনও তার বাড়িতে থাকি।

তারপর এলো রোববারের কাল।

পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে, জামালপুরের একটা সাহিত্য সম্মেলনের দাওয়াত পেলেন রফিক ভাই। আমাকে বললেন, ওই মিয়া, যাইবানি?

আমি তো একপায়ে খাড়া। রফিক ভাইর সঙ্গে থাকতে পারা মানে সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে থাকা। রফিক ভাইর চালচলন, কথাবার্তা, গলা ফাটিয়ে হাসা, পোশাক-আশাক সবকিছুরই আমি মহাভক্ত হয়ে গেছি। তখন পর্যন্ততিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র।

ব্যাগ কাঁধে রফিক ভাইর সঙ্গে বাসে চড়লাম।

এসবের কিছুদিন আগে রফিক আজাদের বিখ্যাত কবিতার বই 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' বেরিয়েছে। কী বই, কী একেকখানা কবিতা। বাংলাদেশের তরুণ কবি, কবি যশপ্রার্থী এবং কবিতার পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই বইয়ে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অসম্ভবের পায়ে' থেকেই তিনি পাঠকপ্রিয়, দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে' তাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' বাংলাদেশের কাব্যজগৎ কাঁপিয়ে দিল।

আমি সেই কবির সহযাত্রী হয়েছি, এরচেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে!

জামালপুরে আমাদের থাকতে দেয়া হল সরকারি এক খামারবাড়ির বাংলোয়। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া রাত। আমাদের পানের ব্যবস্থা ছিল না। বাংলোর বারান্দায় বসে সিগ্রেট খাই দু'জনে। সামনে বিশাল সূর্যমুখীর মাঠ। মাঠের কোণে একটা চাপকল। চাঁদের আলো সরাসরি পড়েছে সূর্যমুখীর মাঠে। কী যে অপূর্ব লাগছে। চারদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, ফুলের গন্ধ নিয়ে আদুরে একটা হাওয়া কোত্থেকে বয়ে আসে কে জানে। একটা রাতপাখি ডানায় জ্যোৎস্না ভেঙে মাঠের উপর দিয়ে উড়ে যায়। রফিক আজাদের কী হয় জানি না, আমার ভেতরে তৈরি হয় আশ্চর্য এক ঘোর। আশ্চর্য এক তৃষ্ণা যেন ফাটিয়ে দিতে চায় বুক। আমার ইচ্ছা করে চাপকলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, জ্যোৎস্নায় গড়া এক যুবতী তার মায়াবী হাতে চেপে দিক চাপকল। আঁজলা ভরে জল পান করি আমি। আজন্মের তৃষ্ণা মেটাই।

রফিক আজাদেরও বুঝি তখন আমার মতোই অবস্থা। তার ভেতরও তৈরি হয়েছে ঘোর। সেই আশ্চর্য জ্যোৎস্না রাতে আমি তারপর একজন কবির ভেতরকার আরেকজন কবিকে জেগে উঠতে দেখি। একজন মানুষের ভেতরকার আরেকজন মানুষকে জেগে উঠতে দেখি। যে কবি থাকেন অন্তরালে, যে মানুষ থাকে অন্তরালে, সমগ্রজীবনে এক-দুবারের বেশি তার দেখা পায় না অন্য কেউ। রফিক ভাই তার জীবনের কথা বললেন, কবিতার কথা বললেন। অকালে হারিয়ে যাওয়া তার প্রিয় বোনটির কথা বললেন। আর বললেন, সেই মেয়ের কথা। কবিতায় লিখেছিলেন, 'ওপারে লায়লার লালবাড়ি'।

কে এই লায়লা?

কোন সে দূরন্ত প্রেমিক নদী সাঁতরে যায় লায়লার লালবাড়িতে?

জামালপুর থেকে ফিরে এসে রফিক আজাদকে নিয়ে, উপন্যাস লিখলাম, 'দুঃখ কষ্ট'। উপন্যাসের প্রতিটি চাপ্টার শুরু হল রফিক আজাদের কবিতার লাইন দিয়ে। একটি লাইন 'দেয়ালে দেয়ালে, অনিবার্য অন্ধকারে'।

Munshigonj.com

রোববার বেরুবার আট-দশমাস পর আমি জার্মানিতে চলে গেলাম। জার্মানি তখন দুটো দেশ। আমি গেলাম পশ্চিম জার্মানিতে। বন শহরে আমার কয়েকজন বন্ধু ছিল। প্রথমে গিয়ে তাদের কাছে উঠলাম। দিন বিশেক বনে থেকে চলে গেলাম স্টুটগার্টে। স্টুটগার্টে কয়েক মাস থেকে চলে গেলাম পাশের ছোট্ট শহর সিনডেলফিনগেনে। এই শহরটি বলা হয় মার্সিডিস সিটি। কারণ বিখ্যাত মার্সিডিস বেঞ্জের মূল কারখানা এই শহরে।

জার্মানিতে গিয়েছিলাম রোজগারের আশায়। টাকা রোজগার করে জীবন বদলাব। হয়নি। প্রবাস জীবন আমি সহ্য করতে পারিনি। আমাদের দেশের নিম্নস্তরের শ্রমিকের কাজ ছাড়া কোন কাজে পয়সা নেই। ওইসব কাজ আমি করতে পারছিলাম না। তাছাড়া দেশে রয়ে গেছে কত প্রিয় মানুষ, কত প্রিয়জন, তাদের ছেড়ে আছি। আমার মন পড়ে থাকত দেশে, সেসব প্রিয় মানুষদের কাছে। মা-ভাইবোন তো আছেই, যুবতী হয়ে ওঠা প্রেমিকাটি আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, লেখালেখি করে একটা জায়গা তৈরি করেছিলাম সেই জায়গাটি আছে আর আছেন রফিক আজাদ। আমি সবাইকে চিঠি লিখি। সবাই আমাকে চিঠি লেখে। রফিক ভাইকে চিঠি লিখি কিন্তু তার চিঠির কোন জবাব আসে না। দশ-বারোটি চিঠি লেখার পর তার একটা চিঠি পেলাম। চিঠির দুটো লাইন এখনও মনে আছে, 'গদ্য লেখার ভয়ে আমি কাউকে চিঠি লিখি না। কিন্তু মনে মনে প্রতিদিন তোমাকে অনেক চিঠি লিখি। তুমি কেমন আছো, মিলন?'

মনে আছে এই লাইনটি পড়ে আমি শিশুর মতো কেঁদেছিলাম।

জার্মানি থেকে ফিরে এলাম দু'বছর পর। যেদিন ফিরলাম, রফিক ভাইর সঙ্গে দেখা হল তার পরদিন। আমাকে দেখে কী যে খুশি হলেন! সেদিনই বেতন পেয়েছেন, বেতনের পুরো টাকাটা আমাকে নিয়ে দামি মদ খেয়ে শেষ করে দিলেন। একটা মাস কী করে সংসার চলবে একবারও ভাবলেন না।

আবার আগের জীবনে ফিরে এলাম আমি। রোববারে নতুন করে চাকরি হল। ইত্তেফাক ভবনের সামনে ট্রাকচাপা পড়ে মারা গেল এক পথচারী। পুরো শরীর ঠিক আছে শুধু মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে ট্রাকের চাকা। মাথাটা চ্যাপ্টা হয়ে রাস্তার সঙ্গে মিশে গেছে। ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে পুলিশের টাকা-পয়সার

সম্পর্ক। ট্রাফিক পুলিশের হাতে মোটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে উধাও হয়ে গেল। আমি একটা রিপোর্ট লিখলাম রোববারে। পুলিশ সম্পর্কে একটা আপত্তিকর মন্তব্য করে ফেললাম। সেই লাইনটির ওপর 'ছিপি' লাগিয়ে বাজারে ছাড়া হলো পত্রিকা। ছিপি তুলে পুলিশরা সেই লাইন পড়ল এবং দেশের সব পুলিশ ক্ষেপে গেল। '৮৩ সালের কথা। এমন কথাও আমার কানে আসতে লাগল গোপনে আমাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। তখন পুলিশের ঊর্ধ্বতন একজন আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন। তিনি লেখক। রফিক আজাদ যখন টাঙ্গাইলের মওলানা মুহম্মদ আলী কলেজের বাংলার লেকচারার তখন তার ছাত্র ছিল আরেফিন বাদল। বাদল ভাইয়ের সঙ্গে মোসলেহউদ্দিন সাহেবের খুবই খাতির। বাদল ভাইকে ধরে দিনের পর দিন ছুটোছুটি করে আমাকে রক্ষা করলেন রফিক ভাই। সেই আতংকের দিনে প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত রফিক ভাই আমার হাতটা ধরে রেখেছেন, আমার পাশে থেকেছেন। রাতের বেলা তার বাড়িতে নিয়ে রেখেছেন আমাকে। নিজের বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও থাকলে পুলিশ যদি আমাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে!

সেই লেখার অপরাধে রোববার থেকে আমার চাকরি গেল। রফিক আজাদ এবং আরেফিন বাদলের চেষ্টায় মুসলেহউদ্দিন সাহেব ব্যাপারটা ম্যানেজ করলেন।

চাকরি নেই, রফিক ভাইর সঙ্গে তারপরও প্রায় প্রতিদিন দেখা হয়, আগের মতোই চলছে আড্ডা হৈ-চৈ, পানাহার। আমি সিদ্ধান্তনিয়েছি আর চাকরি-বাকরি করব না, লেখাই হবে আমার পেশা। বাংলাদেশে তখন পর্যন্তশুধু লেখাকে পেশা করার সাহস পায়নি কেউ। আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সের যুবক ইমদাদুল হক মিলন এরকম এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্তনিয়ে নিল।

আত্মঘাতী কেন?

তখন বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় একটা গল্প লিখলে বড়জোর ২০ টাকা পাওয়া যায়। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। প্রকাশকদের পায়ে ধরলেও বই ছাপাতে চায় না। ঈদ সংখ্যা বেরোয় দু'তিনটা। উপন্যাস লিখলে টাকা পাওয়া যায় তিনশ' থেকে পাঁচশ'। তারপরও নাক উঁচু পত্রিকাগুলো তরুণ লেখকদের পাত্তা দেয় না।

আমার তখন কী যে মর্মান্তিক অবস্থা। বহুকাল অপেক্ষা করা কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে যাওয়া মেয়েটিকে বিয়ে করেছি। সে সন্তানসম্ভবা। বড় ভাইর সংসারে থাকি, দশটা টাকা রোজগার করতে পারি না। উঠতে-বসতে নানা প্রকারের অপমান। সহ্য করতে না পেরে একদিন স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার শ্বশুরপক্ষ টাকাঅলা, কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই। একমাত্র মেয়েটি নিজের পছন্দে আমার মতো একটা অপদার্থকে বিয়ে করেছে, জার্মানির মতো দেশে গিয়েও যে দুটো পয়সা রোজগার করে ফিরতে পারেনি, তাদের বাড়িতে যাওয়া আমার নিষেধ। কিন্তু বড় ভাইর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। স্ত্রী বেচারিটি মন খারাপ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠল। ওর বাবা নেই, মা এবং দুই ভাই সে তাদের নয়নের মণি। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মা খুবই কান্নাকাটি করলেন, ভাইরা বুকে টেনে নিল বোনকে। ওদের যৌথ পরিবার। ছয় মামা এবং এক বোন বিশাল একটা বাড়ির একেক ফ্ল্যাটে থাকেন। বোন সবার বড়। সেই বোনের মেয়েটি আমার স্ত্রী। মামাশাসিত সংসার। আমার শাশুড়ির পিঠাপিঠি ভাইটি সংসারের অধিকর্তা। তার আদেশে বিশাল পরিবারটি চলে। আমার শ্বশুর অল্প বয়সে মারা যান। ব্যবসায়ী ছিলেন। টাকা-পয়সা ভালোই রেখেই গেছেন। শাশুড়ি সেই টাকা বিজনেস করার জন্য ভাইকে দিয়েছেন। লঞ্চ-জাহাজের ব্যবসা করে অগাধ টাকা-পয়সার মালিক হয়ে গেছে পরিবারটি। ভদ্রলোক যেমন টাকাঅলা তেমনি রাগি। আমার মায়ের মামাতো বোনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। সম্পর্কে আমার খালু, অন্যদিকে স্ত্রীর বড় মামা। আমার সঙ্গে ভাগ্নির বিয়েতে তিনিই বাগড়া দিয়েছিলেন। আর তার আদেশের বাইরে কিছুতেই যাবে না পরিবারটি। তবু আমাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর ওই বাড়িতে যাওয়া আমাদের নিষিদ্ধ হয়েছে। তারপরও দায়ে পড়ে আমার নরম নিরীহ স্ত্রীটি চোখ মুছতে মুছতে সেই বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। ওই যে সে নিজ থেকে গিয়েছে তাতেই পাথরটা গলে গেল। মা-ভাইরা তো তাকে বুকে টেনে নিলই, মামা-মামীরা, মামাতো ভাইবোনরাও নিল। কিন্তু আমি তখনও ওই

Munshigonj.com

বাড়িতে ঢুকিনি। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে রাত কাটাই। দু'তিনটা দিন মাত্র। শ্বশুরবাড়ির কাছে লম্বা মতো একটা ঘর ভাড়া নিলাম। উপরে টিন চারদিকে ইটের দেয়াল। ভাড়া সাতশ' টাকা। নিজেদের বাড়ি থেকে আমার বিয়ের খাটটা, দুটো সিলিং ফ্যান আর আমার লেখার টেবিলটা নিয়ে এসেছি। তাদের প্রাসাদের মতো বাড়ির পাশে এরকম একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি, স্ত্রী লজ্জায় সেই বাড়িতে আসে না। টিফিন কেরিয়ারে করে দু'বেলা আমার খাবার পাঠায়। ফ্যানের হাওয়ায় ঘর ঠাণ্ডা হয় না। গরমে ঘামে ভাসতে ভাসতে আমি মাথা গুঁজে উপন্যাস লিখি।

ওই ঘরে এসে রফিক আজাদ আমাকে একদিন দেখে গেলেন। আমার দুঃখ-দারিদ্র্যের জীবন, অপমানের জীবন পাত্তাই দিলেন না। অতি কষ্টে আমি একটা কেরু কোম্পানির জিনের পাইট ম্যানেজ করেছিলাম, ওই খেয়ে জীবন ও সাহিত্য নিয়ে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে চলে গেলেন। সেই ভাষণে মন এবং কব্জির জোর তৈরি হল। 'ভূমিপুত্র' নামে একটা উপন্যাস লিখলাম, কিছু প্রেমের গল্প লিখলাম। প্রকাশকদের সঙ্গে কথা হল প্রতি মাসে ৪/৫ ফর্মার একটা করে প্রেমের উপন্যাস লিখব, তারা থোক কিছু টাকা দেবেন।

লিখতে লাগলাম। জীবন বদলাতে লাগল।

তখন সারাদিন লিখি, সন্ধ্যায় গিয়ে রফিক আজাদের সঙ্গে আড্ডা দেই। এ সময় রফিক ভাইর কবিতার বই বেরুলো। বইয়ের নাম 'প্রিয় শাড়িগুলো'। বইটা আমাকে উৎসর্গ করলেন। বইয়ের একটা কবিতার নাম 'জ্যোৎস্নাকে আমার চাই'।

জ্যোৎস্না আমার স্ত্রীর নাম। হাসতে হাসতে রফিক ভাইকে বললাম, আমার জ্যোৎস্নাকে তুমি চাও?

রফিক ভাই বললেন, আরে না বেটা, আমি যেই জ্যোৎস্নাকে চাই তাকে একজীবনে পাওয়া যায় না। তার জন্য বহুজীবন অপেক্ষা করতে হয়!

রফিক ভাইর সঙ্গে এদিক-ওদিক সাহিত্য সম্মেলনে যাই। যশোর না খুলনায় যেন প্রবন্ধ সাহিত্যের আলোচনা সভার সভাপতির হঠাৎ শখ হল ঢাকা থেকে আগত কবি এবং ঔপন্যাসিকের চেহারা দেখবেন। তিনি এই দু'জনকে কখনও দেখেননি। আমার হাত ধরে মঞ্চে উঠলেন রফিক আজাদ। বললেন, সভাপতি সাহেব, আমাদের চেহারা দেখে আপনার ভালো লাগবে না। আমরা লিখি ভালো কিন্তু চেহারা জলদস্যুদের মতো।

ভদ্রলোক হতভম্ব।

এসব করে আমাদের দিন যায়। রফিক আজাদের দুটো বই সম্পাদনা করলাম আমি। 'বাছাই কবিতা' এবং 'প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা'। ততদিনে রফিক ভাই তার জীবন বদলে ফেলেছেন। হঠাৎ হঠাৎ তাকে কেমন অন্যমনস্ক এবং বিষন্ন হতে দেখি। এমন মন খারাপ করা একেকটা কবিতা লেখেন,

বালক ভুল করে নেমেছে ভুল জলে
বালক পড়েছে ভুল বই
পড়েনি ব্যাকরণ, পড়েনি মূল বই।

এসব কবিতা পড়ে আমার বুক হু হু করে, ইচ্ছা করে রফিক আজাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তার হাতটি ধরে বলি, প্রিয় বালক রফিক আজাদ, আমি এখনও সেই আগের মতোই তোমার অনুরাগী।

Munshigonj.com